গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২৮ অক্টোবর - ৩ নভেম্বর, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

গদ্দাফির নৃশংস হত্যাকে ধিক্কার জানাল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী হিসাবে পরিচিত লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মুয়াম্মার গদ্দাফিকে যেভাবে ন্যাটো এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট তথাকথিত 'ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিলে'র বিদ্রোহীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, আমরা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। এইভাবে 'মানবিক হস্তক্ষেপ'-এর নামে সাম্রাজ্যবাদী দুর্বৃত্তরা এক বর্বর অমানবিক কাজ করল। এ কথা পরিষ্কার যে, একের পর এক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শাসনকে ধ্বংস করা ও সেইসব দেশের তৈলসম্পদকে লুণ্ঠন করার যে ঘৃণ্য কর্মসূচি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা চলছে, তারই ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাতে খোলাখুলি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে স্বাধীন লিবিয়ার শাসনব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়ে একটা পুতুল সরকার বসানোই সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র মতলব। লিবিয়ার ঘটনায় এ কথা আবার প্রমাণিত যে, প্রতিটি দেশের জনগণের নিজস্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বনিযুক্ত অভিভাবকরা আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে বেপরোয়াভাবে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, অন্যান্য সকল বুর্জোয়া দেশের মতোই লিবিয়ার জনগণও তীব্র বেকারি ও অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগছে এবং তাদের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের ক্ষোভের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু দেশে একটি যথার্থ বিপ্লবী দল, এমনকী কোনও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের অনুপস্থিতির ফলে ওই বিক্ষোভ সঠিক পথে প্রবাহিত হতে পারেনি। এরই সুযোগ নিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা, যারা নিজ নিজ দেশে গণতন্ত্রের ভড়ংয়ের আড়ালে জনগণের সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায়নীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কণ্ঠরোধ করছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অতি তৎপরতায় দমন করছে, তারাই বাইরের একটি দেশে বন্দুকের মুখে 'গণতন্ত্র রপ্তানি' করার 'পবিত্র' অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটি দেশের শাসনব্যবস্থা অথবা সামাজিক কাঠামো কেমন হবে তা নির্ধারণ করার নাগরিকদের সার্বভৌম অধিকারকেই এভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা নির্দ্বিধায় পদদলিত করছে। আজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও বিশ্বশান্তির দুর্গ হিসাবে যদি পূর্বের মতো শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকত তবে সাম্রাজ্যবাদী হাঙরদের সাহস হত না এভাবে বিনা বাধায় দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ার।

আমরা পুনরায় বলতে চাই, বিশ্বের সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি যদি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তীব্র করার উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তরিকতার সাথে অতি দ্রুত নিজেদের ঐক্য ও সংহতি গড়ে না তোলে এবং তাকে শক্তিশালী না করে, তবে পশ্চিম এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে সাম্রাজ্যবাদী ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করা যাবে না, যা হবে মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

ছত্রধর মাহাতোর সাথে আলোচনায় বসুক সরকার

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠিতে দাবি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

''ছত্রধর মাহাতোসহ জনসাধারণের কমিটির বন্দি নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় বসাটা জরুরি। এ পথেই জঙ্গলমহলে শান্তি ফেরানো সম্ভব।'' ২১ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু।

জঙ্গলমহল সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ঐ দিনই একটি চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয়। তার প্রতিলিপি সাংবাদিকদেরও দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গেই কমরেড সৌমেন বসু আরও বলেন যে, জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনী নিয়ে বর্তমান সরকারও সিপিএমের পথেই হাঁটছে, যেজন্য সিপিএম একে সমর্থন জানাচ্ছে, কিন্তু এই পথে শান্তি অসম্ভব।

জঙ্গলমহলে আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত চিঠিতে বলা হয়েছে,

''আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বনাঞ্চলের চিরঅবহেলিত জনজাতির মানুষরা শোষণ, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ আমল থেকেই জঙ্গলমহল ছিল অবাধ লুণ্ঠন, অত্যাচার, নির্দয়তার মুক্ত ক্ষেত্র। দেশ স্বাধীন হলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকী সিপিএম শাসনে মাফিয়া-পুলিশ-পঞ্চায়েত চক্রের নির্মম জুলুম অত্যাচার অসহায়ভাবে মুখ বুজে মেনে চলাই ছিল রেওয়াজ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, রুজি রোজগার সব কিছু থেকেই তারা ছিল বঞ্চিত। তার উপর ছিল জোর জুলুম, মিথ্যা কেসে পুলিশি হয়রানি। এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে এলাকার গরিব আদিবাসী সহ সাধারণ মানুষ মাঝে মাঝেই প্রতিবাদ জানাতো। এই ছিল তাদের রোজনামচা।

সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেল, ২২ অক্টোবর রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলে দু'জন প্রতিনিধি মেদিনীপুর জেলে গিয়ে ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মত বিনিময় হয়েছে এবং শীঘ্রই জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে সরকারের বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আশা করি সরকার জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে।

২ নভেম্বর, ২০০৮ সিপিএম প্রভাবিত শালবনীতে জিন্দাল কোম্পানির ইস্পাত কারখানা উদ্বোধন করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ফিরে আসার সময় তাঁর কনভয়ের একটি গাড়ির সামনে মাইন বিস্ফোরণ হয়। যদিও কারখানা উদ্বোধনের তিন দিন আগে থেকে বিশাল সশস্ত্র পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী কোলাঘাট থেকে শালবনী পর্যন্ত রাস্তা আধুনিক যন্ত্র দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে নিশ্ছিদ্র পাহারা এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থায়

চারের পাতায় দেখুন

আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল

ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্যের প্রতিবাদে চলা ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সমর্থনে ১৯ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে বিক্ষোভ মিছিলে কলকাতায় মার্কিন কনসুলেটের সামনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। ছবিটি আমেরিকার 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' পত্রিকার (india.wsj.com)।

অধিগ্রহণের মাধ্যমেই ডানলপের পুনরুজ্জীবন সম্ভব

এ আই ইউ টি ইউ সি

৮ অক্টোবর হুগলির ডানলপ টায়ার কারখানার মালিক সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে কারখানার শ্রমিকদের পথে বসাল। ২০০৬ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমেই মালিক পক্ষ, তদানীন্তন সিপিএম পরিচালিত সরকার এবং সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি মিলিতভাবে ডানলপকে রুগ্ন করার পাকা ব্যবস্থা করেছিল। ডানলপের মালিক পবন রুইয়া কারখানার সম্পদ ধীরে ধীরে বিক্রি করে, শ্রমআইন লংঘন করে, শ্রমিকদের সর্বস্বান্ত করে মুনাফার পাহাড় গড়েছে। কারখানার এক শ্রমিক অরুণ রক্ষিতের কথায়, '২০০৬ সালে কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত নেতারা আমাদের আগাম অবসর প্রকল্পে (ইআরএস) সই করিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের পাওনা এখনও মিটিয়ে দেওয়া হয়নি।' শুধু শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা মেরে দেওয়াই নয়, কোয়ার্টার, হাসপাতাল সহ ডানলপের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করা ও চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থবিরোধী কালাচুক্তিও ২০০৬ সালেই মালিক, সিপিএম পরিচালিত সরকার এবং সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি

চারের পাতায় দেখুন

বিজেপির রথযাত্রা ঃ দুর্নীতির শিরোমণিরাই দুর্নীতি হঠানোর ভনিতা করছে

বিজেপির শীর্ষ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি ১১ অক্টোবর থেকে ৪০ দিনের জনচেতনা যাত্রা শুরু করেছেন। দেশ জুড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবল তোপ দাগতেই নাকি এই যাত্রার আয়োজন। বিজেপির প্রথম সারির অন্যান্য নেতারাও একবাক্যে আদবানির এই রথযাত্রার অনুগামী হয়েছেন। হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ন নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে সংসদে বিজেপির মুখপাত্র সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি প্রত্যেকে আদবানির পাশে দাঁড়িয়েছেন। যেন বিজেপি সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল একটি পার্টি। অথচ সংবাদে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এই যাত্রার পাল্টা কর্মসূচি হিসাবেই মোদি গুজরাটে সদভাবনা অনশন শুরু করেন। উদ্দেশ্য — প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে আদবানিকে ফাঁকা মাঠ না দেওয়া। 'ভাইব্র্যান্ট' হিসাবে তুলে ধরা গুজরাট থেকেই আদবানির এই যাত্রা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বিহার থেকে শুরু করতে হয়। এই যাত্রার উদ্বোধন করেছেন বিহারে বিজেপির জোটের শরিক মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। আদবানি যাতে সরকার বিরোধী পালের হাওয়া একাই কেড়ে নিতে না পারেন সেজন্য নীতীশ কুমার যাত্রার শুরুতে হিরো হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্লোগান তুলেছেন, শুধু দুর্নীতি দমন নয়, উন্নয়নই আসল কথা। আবার বিজেপি ঘনিষ্ঠতার জন্য যাতে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে ধস না নামে সেজন্য তিনি কিষানগঞ্জে মুসলিম সংগঠনগুলির অবস্থান বিক্ষোভের মঞ্চে হাজিরও হয়েছেন। আসলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাত রাঙানো বিজেপি আগামী নির্বাচনে আদবানিকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্য থেকেই এই জনচেতনা যাত্রা শুরু করেছে। এর সাথে দুর্নীতি বিরোধী চেতনা প্রসারের কোনও সম্পর্কই যে নেই, তা বিজেপির দিকে তাকালেই চোখে পড়ে।

রথযাত্রা পথে সভাগুলিতে আদবানি বলে চলেছেন, 'ঘুষ দেব না, ঘুষ নেব না' — এটা আপনারা সকলে শপথ নিন। অথচ বিজেপির দুর্নীতির তালিকাটা কিন্তু কম দীর্ঘ নয়। এন ডি এ-তে থাকার সময়ই টেলিকম কেলেঙ্কারি, চিনি কেলেঙ্কারি, ইউ টি আই কেলেঙ্কারি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, এমনকী মৃত সৈনিকদের কফিন কেলেঙ্কারির মতো বিভিন্ন কেলেঙ্কারির নায়ক এরা। সম্প্রতি রেড্ডি ভাইদের খনি কেলেঙ্কারি, ইয়েদুরাপ্পার জমি কেলেঙ্কারি বিজেপির দুর্নীতির তালিকাকে আরও দীর্ঘ করে তুলেছে। সবচেয়ে বেশি শোরগোল উঠেছে মধ্যপ্রদেশের সাতনার ঘটনায়। জনচেতনা যাত্রার আগের দিন ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে সংবাদ পরিবেশন করার জন্য সাংবাদিকদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার ভেট দেওয়া হয়। একে ঘুষ ছাড়া কী বলে? এটা কি টাকা ঘুষ দিয়ে প্রচার কেনা নয়? একে দুর্নীতি ছাড়া কী বলে? তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনচেতনা যাত্রা করার অধিকার কি বিজেপির আছে?

এর পরেও বিজেপি নেতারা ও আদবানি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কামান দাগছেন। তিনি বলছেন, 'আমার এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়, বিজেপির মধ্যেও দুর্নীতির গন্ধ থাকলে সততার সাথে তা মোকাবিলা করব।' কিন্তু মানুষ এই বক্তব্যে আস্থা রাখবে কীভাবে? যে মুনাফা সর্বস্ব অর্থনীতি দুর্নীতির আঁতুড় ঘর, তার গায়ে আঁচড়টিও দেব না, হিন্দুত্বের নাম নিয়ে তাকে রক্ষা করব, এদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভাষণ দেব — এটা শঠতা ছাড়া কী? এ সমস্ত ভণ্ড, ধড়িবাজ নেতারা জনসাধারণের চোখে সৎ হওয়ার কত চেষ্টাই না করে থাকেন। এঁরা চুরি করতে সাহায্য করেন, নিজেরাও চুরিতে যুক্ত থাকেন, আর বলেন — চুরি করা উচিত নয়। আবার দেশের মানুষকে প্রতারিত করতেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই ধরনের যাত্রার আয়োজন করেন।

বিজেপি হঠাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ছে কেন? আসলে মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে কংগ্রেস চূড়ান্ত ব্যর্থ। কংগ্রেসের বহু নেতা ও মন্ত্রী দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এই অবস্থায় আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন দেশজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিকে পুঁজি করতে চাইছে বিজেপি। তাই তারা ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী যাত্রায় সামিল হয়েছে।

বিজেপি নেতাদের ত্যাগস্বীকার এতখানি যে তাঁরা এই রথযাত্রা করছেন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিকে নির্ভর করে। গোটা রথটাই বাতানুকূল। এতে রয়েছে বাথরুম ও ডাইনিং টেবিল সহ ১০টি আসন। ২৩টি রাজ্যের ১০০টি জেলার ১২ হাজার কিমি পথ পাড়ি দেওয়ার কথা এই রথের। এই যাত্রা দেখভালের জন্য ৪টি হেলিকপ্টার সবসময় মজুত রয়েছে।

জনজীবনের অর্থনৈতিক দাবিগুলি নিয়ে কোথাও বিজেপির আন্দোলন নেই। যে দল সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে কোনও আন্দোলন তো করেই না, উল্টে ক্ষমতাসীন হয়ে যেখানে যতটুকু আন্দোলন হয় তা নৃশংসভাবে দমন করে, সেই দল আজ দুর্নীতি নিবারণের জন্য আন্দোলন করবে বিষয়টাই আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কি? তাছাড়া অত্যন্ত সততার সাথে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন হলেও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, যদি না বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামো — যার অভ্যন্তরেই জন্ম নিচ্ছে দুর্নীতি, তাকে পাল্টানো হয়। সামাজিক অসাম্যের কারণই এর মূলে। দুর্নীতি দূর করতে হলে আগে দুর্নীতির মূল কারণকে অপসারিত করতে হবে।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

বিশিষ্ট শিল্পী কমরেড অরুণ সরকার ১১ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর অসুস্থ হয়ে তিনি আর স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতেন না।

১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে তিনি গণশিল্পের চর্চা শুরু করেছিলেন। '৭০-এর দশকে, '৮০-এর দশকে, যখন দলের কোনও শিল্পী সংগঠন ছিল না, ছিল না এখনকার মতো শিল্পী যোগাযোগ, তখন গণআন্দোলনের পরিপূরক প্রায় সব ধরনের শিল্পকর্মে ছিল তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। পোস্টার, ফেস্টুন, মঞ্চ নির্মাণ থেকে শুরু করে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে ভিত্তি করে তাঁর আঁকা ছবির পথপ্রদর্শনী বহু বার হয়েছে। সে সময় প্রবল আর্থিক সংকট সত্ত্বেও এসব কাজে অর্থব্যয়ে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। '৭০-এর দশকে ভিয়েতনামের শিশুদের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতায় কমসোমলের মিছিলে কিশোরদের বুকে ঝুলছিল যে ছবিগুলি, সেগুলি ছিল তাঁরই হাতে আঁকা। '৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত কিশোর কমরেড মাধাই হালদার শহিদ বেদি তাঁরই পরিকল্পনায় নির্মিত। তাঁর তৈরি বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, নেতাজি প্রমুখ মনীষীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নির্মিত চিত্র বা ভাস্কর্যে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতিবাদী মানসিকতা, তেমনি বন্যা, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি ছবি এঁকে অর্থ সংগ্রহ করে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। 'আর্ট এজ' শিল্পী সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড অরুণ সরকার সুস্থ শিল্প আন্দোলনের স্বার্থে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন অন্যান্য শিল্পী সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে ৭০ বছর বয়সে প্রয়াত কমরেড অরুণ সরকারের মরদেহ ১২ অক্টোবর নার্সিং হোম থেকে খিদিরপুরে তাঁর বাসভবনে এবং প্রিয় স্টুডিওতে নিয়ে গেলে তাঁর বহু ছাত্র ও এলাকার নারী-পুরুষ এবং দলের কর্মীরা শোকাকুল চিত্তে সেখানে সমবেত হন। তিনি ছিলেন সকলের অতি প্রিয় 'অরুণদা'। পাড়ার ক্লাবগুলি মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়।

দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড সরকারের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর পক্ষে কমরেড প্রণব মাইতি এবং অন্যান্যরা। আর্ট এজ-এর অর্ধেন্দু সরকার ও অরূপ মণ্ডল মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড অরুণ সরকার লাল সেলাম

আসামে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও-র জয়

মধ্যপ্রদেশের পর আসাম। মধ্যপ্রদেশের গুনায় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে বিজেপি ও কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনকে পরাস্ত করে সমস্ত আসনে জয়লাভ করেছিল ডি এস ও প্রার্থীরা। এবার আসামে অগপ এবং কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠনকে পরাস্ত করে রাজধানী গুয়াহাটিতে কামাখ্যা রাম বড়ুয়া গার্লস কলেজে সাধারণ সম্পাদক পদ দখল করল ডিএসও। গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই জয় রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে আন্দোলনই ছাত্রমহলে এ আই ডি এস ও-কে খুবই জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। অন্যদিকে সরকারি জনবিরোধী শিক্ষানীতি অনুমোদন করায় ছাত্রসমাজের কাছে এ বি ভি পি, এন এস ইউ (আই) প্রভৃতি সংগঠনের সংকীর্ণতাবাদী ও ছাত্রস্বার্থ বিরোধী চরিত্র প্রকট করেছে। দুটি কলেজে ডি এস ও-র জয় ছাত্রস্বার্থে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে।

শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে
যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৪৪২১৪৬

ঘাটশিলায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের রাজনৈতিক ক্লাস

৮-১০ অক্টোবর ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এক রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, অধ্যাপক-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে ৩৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কলেজ ও স্কুলের আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্যারা টিচার, ভোকেশনাল টিচার, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

৮ অক্টোবর বিকাল ৫-৩০টায় পতাকা উত্তোলন ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এই রাজনৈতিক ক্লাসের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। মাল্যদান করেন যথাক্রমে স্টাডি সেন্টারের তত্ত্বাবধায়ক কমরেড মলয় বসু, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পক্ষে বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পক্ষে কমরেড তপন কুমার সামন্ত, প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে কমরেড কার্তিক সাহা, এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

কমরেড সৌমেন বসু উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতে প্রতিনিয়িত উদ্ভূত সংকট নিরসনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দলের মর্যাদা ও শক্তি যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা তিনি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে দলের বিস্তৃতি নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রভাব ক্রমশ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তিনি অবহিত করেন। 'কেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' ছিল ক্লাসের পাঠ্যবিষয়। এ সংক্রান্ত প্রতিনিধিদের নানা প্রশ্ন সংযোজিত করে তিনি প্রাণবন্ত আলোচনা করেন।

১০ অক্টোবর সমাপ্তি অধিবেশনে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য ও অসাধারণ জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেধাবী ছাত্র কীভাবে সমাজের তথা যুগের প্রয়োজনে শুধুমাত্র দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা নয়, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ-এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ও বর্তমান বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম 'অথরিটি হিসাবে আজ গণ্য হচ্ছেন, তা তিনি ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধি তাঁর কাছ থেকে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন, কেমন করে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর বাবা-মায়ের চোখের জল এড়িয়ে, জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে পিতামাতার প্রত্যাশা পূরণ না করে, সাধারণের চোখে আপাত-নিষ্ঠুরতার মধ্যেও এ দেশের অগণিত মা-বাবার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। বিপ্লবের স্বপ্নে আবিষ্ট কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর অন্তঃকরণ। কমরেড অসিত ভট্টাচার্য মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, পারিবারিক স্নেহ-বন্ধন এঁদের বিপ্লব সাধনায় কোনও ক্রমেই বাধা হয় নি। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে প্রবল সংগ্রাম করতে হবে। পুঁজিবাদী ভাবনা-ধারণা, 'ক্যারিয়ারিজম', সিনিসিজম এবং ফ্রাস্ট্রেশন প্রভৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ লড়াই করতে হবে। একই সঙ্গে নিজ সন্তানদের নিছক 'ক্যারিয়ারিস্ট' না করে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে শৈশব থেকেই। তবেই আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা যাবে। মানুষ করবার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতায় এ আই ডি এস ও

এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ২২ অক্টোবর এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন,

রাজ্য সরকার এই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলতন্ত্র থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালন সংস্থাকে ভেঙে দিতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে তারা একটি অর্ডিন্যান্স মন্ত্রীসভার অনুমোদন নিয়ে জারি করতে চলেছে। সংবাদমাধ্যমে যতটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জানা যাচ্ছে যে, কোনও মহলে কোনও আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক রূপরেখা ছাড়াই এই অর্ডিন্যান্স জারি করা হচ্ছে এবং পুনর্গঠিত এই পরিচালন পর্ষদে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে না। পরিচালক সংস্থাগুলি গঠিত হবে রাজ্য সরকার, ইউ জি সি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে।

এ রাজ্যে বিগত সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের আমলে বাস্তবে শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত হয়েছে। '৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরপরই তারা ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সহ শিক্ষার সাথে জড়িত কোনও স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ না করে অগণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের সুবিধামত শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে, এবং শিক্ষাঙ্গনকে কলুষতা মুক্ত করার নামে তারা সেদিন এমনভাবেই বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছিল, যার ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত শিক্ষা ক্ষেত্রটাই তাদের দলীয় নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল।

বিগত ৩৪ বছরের শাসনে তাদের সেই দলীয় নিয়ন্ত্রণ শিক্ষাঙ্গনেও কায়েম করেছিল ফ্যাসিস্ট সুলভ শাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে কলেজ স্কুলে সমস্ত পদে, এমনকী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত — প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, দলীয় আনুগত্যই ছিল প্রধান মাপকাঠি। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এ রাজ্যে সিপিএম-এর ফ্যাসিস্টসুলভ শাসনের পরিবর্তন ঘটেছে। রাজ্যের শিক্ষানুরাগী জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএম-এর দলতন্ত্রের অবসান হবে এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে। একথা সকলেই মনে করেন যে, পূর্বতন সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের প্রচলিত বিধিকে অনুসরণ করে শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তাই এ রাজ্যের জনগণের প্রত্যাশা ছিল ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষাবিদ-ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-বুদ্ধিজীবী-অভিভাবক সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল অংশের মানুষের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ আলোচনা চালিয়ে তার ভিত্তিতে রূপরেখা ঠিক করা হবে, এবং অবশ্যই পরিচালক সংস্থাগুলিতে সদস্যরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। কিন্তু যেভাবে শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলিকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা তা পুনর্গঠন করা হচ্ছে, তাতে জনগণের মধ্যে গভীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, এভাবে গঠিত হলে কমিটিগুলি কি যথার্থই গণতান্ত্রিক হবে, নাকি একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হবে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও যে বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল তা চিড় খেয়েছে। মনোনীত ব্যক্তিরা দলীয় নিয়ন্ত্রণে থাকুন, বা না থাকুন তাঁরা কখনওই সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বাস্তবে বিরোধিতা করতে পারেন না।

২৪ অক্টোবর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস

নীতি নির্ধারক কমিটিগুলিতে সরকার কোনও ছাত্র-স্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনও কণ্ঠস্বরও থাকছে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসরণ করে সারা দেশেই রাজ্য সরকারগুলো লাগামহীনভাবে শিক্ষার ব্যাপক বেসরকারীকরণ, ব্যবসায়ীকরণ করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে যাতে কোনও সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে গঠিত ন্যাশনাল নলেজ কমিশন এবং যশপাল কমিটি শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থাকে যেভাবে পুনর্গঠন করতে বলেছে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে তারই ছায়া দেখা যাচ্ছে।

বিধানসভায় কোনও বিতর্ক না করে এমন সময়ে এই সিদ্ধান্ত করা হল, যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসবের কারণে বন্ধ।

কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় এ রাজ্যে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ এবং সমস্ত মহলেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে এই নীতি পরিবর্তনের জোরালো দাবি উঠেছিল। আমরা আনন্দিত যে, এই প্রবল জনমতকে মর্যাদা দিয়ে রাজ্য সরকার পাশ-ফেল প্রথা চালু রাখার এবং তার জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করার কথা ঘোষণা করেছে। আশা করি, শিক্ষা পরিচালন সংস্থা গঠনের বিষয়েও জনমতকে মর্যাদা দিয়ে তারা এই অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্স জারির সিদ্ধান্ত বাতিল করবে। পাশাপাশি, ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

সংগ্রামের দৃপ্ত শপথ নিয়ে গড়ে উঠল জবকার্ড হোল্ডার মজুর সমিতি

জবকার্ডধারী মজুরদের নানা দাবি দাওয়া নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৈরি হল 'সারা বাংলা জবকার্ড হোল্ডার মজুর সমিতি'। দেশের মধ্যে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। ১৪ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণার শহিদ সদনে (অশোকনগর) অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। রাজ্যের ১৫টি জেলার ৩৫০টি গ্রামকমিটির ১১৫০ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

এটা নির্মম বাস্তব যে পুঁজিবাদী শোষণে কৃষক আজ দলে দঙ্গলে জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। গত সাড়ে তিন দশকে রাজ্যে খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৯০ লক্ষ। জমিতে মাথাপিছু কাজের পরিমাণও তাই কমে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত হারে। ঘরে ঘরে আজ অর্ধাহার, অনাহার। পুঁজিবাদী শাসন শোষণের এই নির্মম পরিণতি দেখে এ আই কে কে এম এস বহু আগেই দাবি তুলেছিল — 'খেতমজুরদের সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরি দিতে হবে।' এই আন্দোলনের ফলে ও সমাজের অন্যান্য অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের চেষ্টায় ২০০৬ সালে চালু হয় 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন' (এন আর ই জি এ)। এই আইন বলে জবকার্ডধারী একটা পরিবারের বছরে একশ' দিন কাজ পাওয়ার কথা। এই রাজ্যে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির হার দিনে ১৩০ টাকা।

জবকার্ডধারী মজুরদের গত পাঁচ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনা গেল কনভেনশনে আগত প্রতিনিধিদের মুখ থেকে। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রতিনিধিরা সমস্বরেই বললেন, একশো দিন কাজ দূরে থাক, কাজ পাওয়া যায় বড়জোর দশ-পনের দিন; কাজ করানোর পর টাকা পাওয়া যায় বহুদিন পর — কখনও কখনও বছর গড়িয়ে যায়, একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে পঞ্চায়েতি কর্তা ও প্রশাসনের যোগসাজশে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি। প্রতিনিধিরা বলেন, এর প্রতিকারে কেমনভাবে তারা কে কে এম এসের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন — দাবি আদায় করতে সফল হয়েছেন।

কনভেনশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড শংকর ঘোষ। মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড দাউদ গাজী। প্রতিনিধিরা এই মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন।

এই কনভেনশন দাবি তুলেছে — (১) বর্তমানের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ ও গ্রামীণ মজুরদের দুরবস্থার কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গে জবকার্ড হোল্ডার মজুরদের ন্যূনতম মজুরি ২০০ টাকা ও পরিবার পিছু নয় ব্যক্তি পিছু ২০০ দিনের কাজ দিতে হবে। কাজ দিতে না পারলে মজুরি পুরোটাই বেকারভাতা হিসাবে নিতে হবে। (২) বিড়িশ্রমিক, নির্মাণকর্মী ও অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মত জবকার্ড হোল্ডার মজুরদের কৃষকের জমিতে কৃষিকার্যে জবকার্ড হোল্ডারদের নিয়োগ করতে হবে।

এইসব দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড নন্দ পাত্রকে সভাপতি এবং কমরেড দাউদ গাজীকে সম্পাদক করে ৫০ জনকে নিয়ে এই রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। কনভেনশনে উদ্যোক্তা সংগঠন কে কে এম এস-এর অন্যতম রাজ্য সহসভাপতি কমরেড মদন সরকার ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান বক্তব্য রাখেন। কমরেড পঞ্চানন প্রধান বলেন, আমাদের অভাব অনটন-অনাহার, আত্মহত্যা ইত্যাদি সবকিছুর জন্য দায়ী এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। ভোট দিয়ে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদল করা যায় না। একে বদল করা যায় কেবল বিপ্লবের দ্বারা, গণআন্দোলনের দ্বারা এই লক্ষ্যেই আন্দোলন পরিচালিত করতে হবে।'' কনভেনশনের সভাপতি কমরেড শেখ খোদাবক্স বলেন, আপনারা সবই হারিয়েছেন, পরিণত হয়েছেন দিনমজুরে। এবার লড়াই করে আপনাদের দাবি আদায় করতে হবে। এজন্য সংগঠনকে লৌহদৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে।

গৃহনির্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রসূতিভাতা সহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সকল সুযোগসুবিধা দিতে হবে। (৩) ষাটোর্ধ্ব সকল জবকার্ড হোল্ডারকে মাসিক ৩০০০ টাকা বার্ধক্যভাতা দিতে হবে। (৪) ব্যক্তিগত উপকারদায়ী প্রকল্প সহ এন আর ই জি এ আইনে বরাদ্দ টাকা চুরি-দুর্নীতি-তছরূপ করা চলবে না। (৫) গরিব প্রান্তিক

পুরুলিয়ায় আশা কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

'আশা' কর্মীদের ওপর যে শোষণ বঞ্চনা চলছে তার বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে উঠছে। পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও। পুরুলিয়া জেলাতেও সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে মিছিল সহযোগে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রায় ২৫০ জন আশা কর্মী সুসজ্জিত মিছিল করে স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে উপস্থিত হন এবং দাবিপত্র পেশ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড এম কে সিনহা এবং আশা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিমা রায়। তাঁদের দাবি ছিল বর্তমানে যে ৮০০ টাকা মজুরি পাওয়া যায় নতুন ফর্মুলি চালু করার নামে তাকে কমানো চলবে না, ন্যূনতম বেতন মাসিক ৬৬০০ টাকা হারে দিতে হবে। আশা কর্মীদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে।

বর্ধমানে পরিচারিকা সম্মেলন

'দুটো খাবারের জন্য বাড়ি বাড়ি কাজ করি। কিন্তু খেতে পাই না, ন্যায্য বেতন পাই না, পাই না কোনও মর্যাদা। কারণ আমরা পরিচারিকা।' এই কথাগুলি প্রীতি, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, কাঞ্চন, অঞ্জলি, চায়নাদের। ১৬ অক্টোবর বাম চাঁদাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির প্রথম গাংপুর আঞ্চলিক সম্মেলনে আগত শতাধিক পরিচারিকা তুলে ধরেন তাঁদের জীবনের করুণ কাহিনী।

পরিচারিকাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাঁদের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড লিলি পাল, বর্ধমান জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রভাতী গোস্বামী, এ আই ইউ টি ইউ সি-র বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী। কমরেড রমারানি মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড বীণা গাঙ্গুলিকে সম্পাদিকা করে গাংপুর আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

অধিগ্রহণের মাধ্যমেই ডানলপের পুনরুজ্জীবন সম্ভব

একের পাতার পর

মিলিতভাবে সম্পাদিত হয়েছিল তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের উদ্যোগে।

১৫ অক্টোবর শ্রমিক সংগঠক এ আই ইউ টি ইউ সি-র হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড মিলন রক্ষিত ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডানলপ কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনে সংহতি জানায় এবং সঠিক নেতৃত্বে সচেতন সংগঠিত দৃঢ়পণ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এখানকার শ্রমিক অরবিন্দ হালওয়ারি, মনসুর অনসারি ও তাহেব আলীদের বক্তব্য হল, 'আগের সরকারের আমল থেকেই কারখানার শ্রমিক কোয়ার্টার, হাসপাতাল ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছে। তা এখনও জোর কদমে চলছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এ ভাবে ডানলপকে শ্মশানে পরিণত করে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি নেতারা দেখতে পাচ্ছেন না? এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।'

ডানলপ শ্রমিকদের যদি সত্যিই এই রহস্যের সন্ধান পেতে হয় তাহলে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের মালিকস্বার্থ রক্ষাকারী ভূমিকাকে বুঝতে হবে। একইসঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। লক্ষ রাখতে হবে, পূর্বতন সিপিএম সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির সাথে বর্তমান সরকারের নীতির সত্যিই পরিবর্তন ঘটছে কিনা।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার আগে থেকেই সিপিএম ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিল। পুঁজিপতিরা বুঝেছিল সিপিএম মুখে গরিব দরদের কথা বললেও আসলে মালিকদের বন্ধু। সেদিন বিড়লা ও গোয়েঙ্কারা বলেছিল জ্যোতিবাবুদের খুব কাছ থেকে দেখে বুঝেছি এরা ভাল কমিউনিস্ট। আবার সিপিএমও বুঝেছিল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে হলে পুঁজিপতিদের সেবাদাস হয়েই থাকতে হবে। তাই এ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুরে চাষিদের সর্বস্বান্ত হওয়া দেখেও বলতে পেরেছিলেন, 'সিঙ্গুরে টাটাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।' এ কারণেই ক্ষমতায় বসেই সিপিএম পরিচালিত সরকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মালিক স্বার্থেই কাজ করে গিয়েছে। আর রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণীর উপর চালিয়েছে শোষণ বঞ্চনার স্টিমরোলার।

ডানলপও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সময় থেকেই গোয়েঙ্কার পর ছাবারিয়া ও সর্বশেষ পবন রুইয়া সকলেই ডানলপ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে সরকারি প্রশ্রয়ে রুগ্নতার দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। গোয়েঙ্কার পর বহু ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অনাবাসী ভারতীয় ছাবারিয়া কিনেছিলেন ডানলপ। সিপিএম সরকার শ্রমিকদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, অনাবাসী ভারতীয় মালিক ডানলপের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ছাবারিয়া কারখানা পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে কারখানার সম্পদ বিক্রি করে মুনাফার দিকেই নজর দিলেন বেশি। শিল্প উৎপাদনে উৎসাহের পরিবর্তে কারখানার জমিতে প্রোমোটারির দিকে নজর থাকার ফলেই রাজ্যে যে যৎসামান্য শিল্প-সম্ভাবনা ছিল তাকেও তিনি কবরে পাঠালেন। এভাবে হাজার হাজার বন্ধ কারখানা ও লক্ষ শ্রমিকের চোখের জলের পেছনে কাজ করছে এই সমস্ত ভারতীয় ও অনাবাসী ভারতীয় মালিকদের কারখানার জমিতে প্রোমোটারি করে মুনাফা করার সীমাহীন লালসা। শিল্পায়নের ঢক্কানিনাদ পরিণত হয়েছে প্রহসনে। কারখানার জমি ও সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে প্রোমোটারি ব্যবসাই মূল লক্ষ্য থাকার ফলে কারখানার আধুনিকীকরণ না করে ডানলপকে আজ মৃত্যুশয্যায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর, কফিনের শেষ পেরেকটি পোতার অপেক্ষায় আজ মালিক পবন রুইয়া।

ডানলপের বর্তমান মালিক গোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, ডানলপ মালিক পবন রুইয়া কোনওদিনই কারখানা চালাতে উৎসাহী ছিলেন না। ২০০৫ সালে কারখানা কিনে নিয়ে তিনি উৎপাদনই শুরু করেননি। তার আসল লক্ষ্য ছিল ডানলপের বহুমূল্য জমিসহ অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে মুনাফা করা। সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি-র মদতে এই লক্ষ্য পূরণেই পবন রুইয়া ডানলপকে কবরে পাঠাবার পথ প্রশস্ত করেছেন। তাই আবারও ডানলপ শ্রমিকদের স্বার্থকে দু-পায়ে মাড়িয়ে কারখানা খোলার শর্ত হিসেবে জনগণের আরও কিছু টাকা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা চালিয়ে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিচ্ছেন ডানলপ মালিক। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন 'ডানলপ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনওদিন তাঁদের আলোচনায় ডাকেনি ও তাদের ইউনিয়নের মতামতে কর্ণপাত করেনি। বরঞ্চ ডানলপ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ সম্পাদক কমরেড শ্রীকৃষ্ণ পালকে দীর্ঘদিন সাসপেন্ড করে রেখে সাসপেনশন অ্যালাউন্স পর্যন্ত না দিয়ে চূড়ান্ত শ্রমআইন ভঙ্গকারী ভূমিকা পালন করে গিয়েছে। এই অবস্থায় পূর্ববর্তী মালিক তোষণকারী ভূমিকা ও ইউনিয়নগুলোর শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কাজ যদি আজও চলতে থাকে, তাহলে শ্রমিক স্বার্থই আবার বিপন্ন হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সঠিক নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে ডানলপ সংলগ্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও ডানলপ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ডানলপ অধিগ্রহণে সরকারকে বাধ্য করিয়েই ডানলপের পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

২৭-২৯ নভেম্বর, ঢাকা

২৪টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন

আই এ পি এস সি সি

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি

একের পাতার পর

পুরো এলাকা মুড়ে রেখেছিল। কিন্তু শালবনী থানা এলাকায় মাইন বিস্ফোরণের ঘটনার দিন গভীর রাত্রিতে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরের লালগড় থানার ছোটপেলিয়া গ্রামে পুলিশ নৃশংস বর্বরতায় এলাকার বাড়ি বাড়ি ঢুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, লাথি মেরে গর্ভবতী মায়ের সন্তানের মৃত্যু ঘটায়, বেয়নেটের খোঁচায় এক আদিবাসী মহিলার চোখ নষ্ট করে এবং এক বৃদ্ধ শিক্ষকের হাড়গোড় ভেঙে পঙ্গু করে দেয়। এই ঘটনাই স্ফুলিঙ্গের মতো লালগড়ে বিক্ষোভের বারুদে অগ্নি সংযোগ করে। আন্দোলন আরও ব্যাপক রূপ নেয়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৮ নভেম্বর গরিব আদিবাসী সহ এলাকার সাধারণ মানুষ 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি' (পিসিপিএ) গড়ে তোলে। জনসাধারণের এই কমিটির আন্দোলন ছিল অত্যাচারী পুলিশ-প্রশাসন, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সি পি এম নেতা, সরকারি অফিসার ও পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে। এই কমিটির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন আন্দোলন চালাতে থাকে। মিটিং-মিছিল, অবরোধ, থানা প্রশাসন বয়কট চলতে থাকে। এই আন্দোলন চলাকালীন দীর্ঘ ৯ মাস থানা এবং বিডিও অফিস অচল হয়ে গেলেও সমগ্র এলাকায় কোনও খুন, হামলা, ভাঙচুর, লুণ্ঠনের মতো ঘটনা ঘটেনি। লাগাতার এই আন্দোলনে পুলিশ প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে, অত্যাচারী সিপিএম নেতারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই কমিটির দাবি ছিল দোষী পুলিশের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আমাদের দল এই আন্দোলনে প্রথম থেকেই ছিল এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকেও এই আন্দোলনে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছিলাম, যাতে এই আন্দোলনকে দুই দলের যুক্ত উদ্যোগে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করা যায়। কিন্তু তখন তৃণমূলকে যে কারণেই হোক পাওয়া যায়নি।

এই আন্দোলনের চাপে প্রশাসন বাধ্য হয় পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সাথে ১৩ জুন, ২০০৯ বৈঠক করতে। এই বৈঠকের পর সরকারি কর্তারা ঘোষণা করে 'আলোচনা সন্তোষজনক' হয়েছে এবং পরবর্তী বৈঠকের দিন স্থির হয় ১৪ জুলাই, ২০০৯। কিন্তু এর পরই দেখা গেল আলোচনার পথ বাতিল করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার একযোগে ঘোষণা করল — লালগড়ে মাওবাদী সন্ত্রাস চলছে, ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথবাহিনী নামাচ্ছে। ১৮ জুন, ২০০৯ যৌথবাহিনী নামানো হল। অত্যন্ত ঘৃণ্য চক্রান্ত করে গরিব আদিবাসী ও সাধারণ মানুষের আন্দোলন ভাঙার জন্য শুরু হল ব্যাপক অত্যাচার, লুটপাট, খুনখারাপি, নারীধর্ষণ। সেই দিনগুলিতে সি পি এম একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে জঙ্গলমহল জুড়ে সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীর নৃশংস তাণ্ডব চালিয়েছে। যৌথবাহিনীর পাহারাদারিতে একের পর এক এলাকা দখল করেছিল সিপিএম বন্দুকবাজরা। এলাকার সাধারণ মানুষের উপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছে তা থেকে আমাদের দলের কর্মী সমর্থকরাও বাদ যায়নি। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির অন্যতম নেতা ও আমাদের দলের সংগঠক কমরেড বিবেকানন্দ সাউ সহ ২৩ জনকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। যৌথবাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে এস ইউ সি আই (সি) সমর্থক বুদ্ধেশ্বর মাহাতর ছেলে মারা যায়, ভীম মুর্মুর হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের বাড়ি থেকে মারধর করে উচ্ছেদ করা হয়। দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এস ইউ সি আই (সি) সমর্থকসহ সাধারণ মানুষকে এলাকায় থাকার জন্য হাজার হাজার টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। একপুত্র ও কন্যা বাড়িতে থাকা অবস্থায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এস ইউ সি আই (সি) সমর্থক বিজয় মান্ডির বাড়িতে। ক্রিমিনালবাহিনী নির্বিরোধে তাণ্ডব চালানোর সময় নিরস্ত্র জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে যৌথবাহিনী ক্রিমিনাল বাহিনীকেই সাহায্য করেছে। যৌথবাহিনীর নাকের ডগায় কেশপুর, গড়বেতা সহ রাজ্যের ও বিহার-ঝাড়খণ্ড সহ বাইরের হাজার হাজার দাগী ক্রিমিনালদের জড়ো করে সি পি এম ১১৯টি ক্যাম্প চালিয়েছে। ক্যাম্পগুলি থেকে সারা জঙ্গলমহল জুড়ে পৈশাচিক অত্যাচারের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন কর্তাদের তদারকিতে চলছিল অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির। এই সশস্ত্র ক্যাম্পের অস্তিত্বের কথা পূর্বে স্বীকার না করলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকী পুলিশ যে কীভাবে মিথ্যা মামলা সাজায়, তারও অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে মাইন বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে ধৃত দু'জন স্কুলছাত্র সহ চারজন যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল ৬ এপ্রিল, ২০০৯ পশ্চিম মেদিনীপুরের কোর্টে জমা দেওয়া পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট থেকেই তা বোঝা যায়। অথচ এই নির্দোষ কিশোরদের পুলিশ লকআপে থার্ড ডিগ্রি মেথডে নির্যাতন করা হয়।

সে সময় আমাদের দল বলেছিল, দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত আদিবাসী সহ জঙ্গলমহলের মানুষের উপেক্ষিত দাবিগুলিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সিপিএম দল ও সরকার পলীয় সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে মাওবাদী সাজিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেখানে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠ সহ বীভৎস অত্যাচার চালিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথবাহিনী ও রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহল থেকে মদত ও সাহায্য পেয়েছে সিপিএম। এভাবেই জঙ্গলমহলের জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য 'মাওবাদী বিপদ'-এর ধুয়া তৈরির এক সামগ্রিক চক্রান্ত কাজ করেছে। এজন্যই দেখা গেল, নির্বাচন কমিশনের আওতায় আসার পরে সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনালরা লুকিয়ে পড়ার সাথে সাথেই তথাকথিত মাওবাদীরা হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। বর্তমানে সিপিএম অফিস ও নেতাদের বাড়ি থেকে শিলদা পুলিশ ক্যাম্প থেকে লুঠ হওয়া রাইফেল সহ, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর জন্য তৈরি হাজার হাজার আগ্নেয়াস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামও বেরোচ্ছে, এমনকী নেতাদের বাড়ির কাছ থেকে বহু নরকঙ্কালও পাওয়া যাচ্ছে। অথচ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ও রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা সিপিএম শাসনকালে এসব কিছুই খুঁজে পায়নি। বরং এই অভিযোগ উঠেছে যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সশস্ত্র বাহিনী সেখানে খুন ও ধর্ষণে জড়িত ছিল।

আপনি এ কথাও জানেন, এ দেশে তথাকথিত 'মাওবাদী' কার্যকলাপের সাথে মহান মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি একজন মহান চিন্তানায়ক এবং চীন বিপ্লবের রূপকার ছিলেন। তিনি ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাস করতেন না। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, এ দেশের 'মাওবাদী'রা তাদের কার্যকলাপের দ্বারা মহান মাও সে তুঙ-এর মহত্ত্বকেই ম্লান করছে, যার দ্বারা শোষকশ্রেণীর সর্বাত্মক আক্রমণ পরোক্ষে সাহায্য পাচ্ছে। এই তথাকথিত মাওবাদীরা ঝাড়খন্ড এলাকায় পুলিশি তল্লাশির সময় কিছু কিছু এই এলাকায় এসে আশ্রয় নিত। সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের জন্য এরা কিছু ঘটনা ঘটাত। নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও তারা সুযোগ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই আন্দোলন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত থাকায় তা তারা পারেনি। এখানে সিপিএম এটা কাজে লাগায়।

এই রকম একটা অবস্থায় জঙ্গলমহলের সমস্যার প্রকৃত সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ছত্রধর মাহাতোসহ জনসাধারণের কমিটির বন্দি নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ হিসাবে আপনার প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি তথাকথিত মাওবাদীদের সঙ্গেও আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই পথে না গিয়ে বর্তমান সরকারও সিপিএমের মতো যৌথবাহিনীর অভিযান চালাবার কথা বলছে, যেটা সিপিএমের সমর্থন পাচ্ছে। এ রাজ্যের সকল স্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অসহায় আদিবাসীদের প্রাণহানি, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু এই আন্দোলনকে স্তিমিত করতে সরকার যে পদক্ষেপ নিতে চলেছে তাও বিবেচনা করা দরকার বলে আমরা মনে করি। পুলিশের চাকরিতে জঙ্গলমহলের যুবকদের সংগ্রহ করা সম্পর্কে ঐ এলাকার জনগণের ধারণা, গরিবদের চাকরি দেওয়া এক জিনিস, কিন্তু ছত্তিশগড়ের 'সালওয়া জুডুমের' মতো জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের নিধন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন দমনের কাজে তাদেরই ভাইদের নিয়োগ করার ফলে এই সরকারের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হবে এবং সমস্যাকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতেও পরিণত করবে। তাই এই কাজ থেকে বিরত হওয়া দরকার। লালগড়সহ জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে জনসাধারণের নিম্নলিখিত দাবিগুলি পূরণ হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমরা আশা করব এ বিষয়ে আপনি যথাযথ উদ্যোগ নেবেন।

দাবি সমূহ —

১। জঙ্গলমহলের আন্দোলনে যুক্ত সমস্ত আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ছত্রধর মাহাত সহ সকল বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে,

২। অবিলম্বে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করে এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে,

৩। নিহত প্রতিটি পরিবার ও ধর্ষিতাদের কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,

৪। জঙ্গলমহলে সমস্ত খুনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং খুনের সঙ্গে জড়িত সিপিএম, তথাকথিত মাওবাদী, সিপিএম নেতাদের ও অপরাধী পুলিশ অফিসারদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

৫। সমগ্র জঙ্গলমহলের মানুষের জন্য রাস্তা, বিদ্যুৎ, জলসেচ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জঙ্গলের ওপর আইনমাফিক অধিকার কার্যকর করতে হবে এবং

৬। জঙ্গলমহল সহ রাজ্যের গরিব জনগণের নাগালের মধ্যে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

‘ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন’এর সমর্থনে রাজ্যে রাজ্যে সংহতি মিছিল

ওপর থেকে আমেদাবাদ, গৌহাটি, রোহটক ও পাটনা

ওপর থেকে হায়দ্রাবাদ, ভুবনেশ্বর, ত্রিবান্দ্রম ও কলকাতা

শুধু লিবিয়া নয় সমগ্র আফ্রিকা আজ সাম্রাজ্যবাদী থাবার লক্ষ্য

লিবিয়ার ঘটনা নিয়ে দুনিয়ার তথাকথিত গণতন্ত্রীরা, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যতই উল্লাস করুক, গদ্দাফির নৃশংস হত্যা এবং ওবামা, সারকোজি ও ক্যামেরনের জয়োল্লাস এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভারতের 'নিরপেক্ষ' 'নির্ভীক' সংবাদমাধ্যমে এখন গদ্দাফির স্বৈরশাসনের বিস্তর বর্ণনা। আর এর আড়ালে চাপা দেওয়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের আরও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ও একটা স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বকে নগ্নভাবে কেড়ে নেওয়ার ও তার শাসককে প্রকাশ্যে বর্বরভাবে হত্যা করার কলঙ্কময় ইতিবৃত্ত।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনে ও তথাকথিত বিশ্বায়নের কল্যাণে বিশ্বে নাকি এখন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের তুমুল হাওয়া বইছে। আইনের শাসন নাকি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের 'বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞ'রা বলছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর নাকি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, বিশ্বের কোথাও কেউ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে হত্যা করে পার পাবে না। কিন্তু আমেরিকার ছত্রছায়ায় ফরাসি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ন্যাটো নামক যুদ্ধজোটকে সামনে রেখে লিবিয়ায় যা করল, তারপর ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ কি ঐ বিশেষজ্ঞদের কথায় একমত হতে পারেন?

সেই ৪০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘের সনদে ঘোষণা করা হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের কোনও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, কোনও রাষ্ট্র অপর কোনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে লংঘন করতে পারবে না। সেই রাষ্ট্রসংঘ ২০১১ সালে সার্বভৌম লিবিয়ায় ন্যাটোর বর্বর হানাদারিকে অনুমোদন দিয়েছে। এবং আজ যখন নিরস্ত্র গদ্দাফিকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ছবি দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে গেছে তখন তারা ন্যায়বিচারের আলখাল্লা পরে গদ্দাফির হত্যার তদন্ত দাবি করছে। গদ্দাফির মৃতদেহের পোস্ট মর্টেম করা হয়েছে কিনা, তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। হায় রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার!

দুনিয়ার মানুষ ভুলে যায়নি, কীভাবে এই রাষ্ট্রসংঘের চোখের সামনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাককে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে ফাঁসি দিয়েছে।

দুনিয়া ভুলে যায়নি, কীভাবে রাষ্ট্রসংঘের নাকের ডগায় সাম্রাজ্যবাদীরা পূর্ব ইউরোপের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরে জাতিদাঙ্গা লাগিয়ে দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করেছে। প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন, রক্ত ঝরেছে। আঙুল ওঠেনি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। বরং তারাই আন্তর্জাতিক আদালতে দিয়ে মিলোসেভিচের নামে হুলিয়া জারি করে তাঁকে দেশ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হেগ-এর জেলে বন্দি করে রেখেছে। মিলোসেভিচ আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও উকিল নেননি, নিজেই নিজের কথা বলেছেন আদালতে। হঠাৎ একদিন বিশ্ব জানল, জেলের মধ্যে মিলোসেভিচের মৃত্যু ঘটেছে। রাষ্ট্রসংঘ একবারও বলেনি, এই মৃত্যুর তদন্ত হওয়া দরকার। প্রশ্ন তোলেনি, একটা স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্টকে এভাবে তাঁর স্বদেশ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশের জেলে বন্দি রাখার অধিকার আমেরিকাকে কে দিল।

হাইতির প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদিকে একই ভাবে কিডন্যাপ করে তুলে নিয়ে গেল আমেরিকা। হাইতি আজ চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে। গদ্দাফির মৃত্যুতে যাঁরা গণতন্ত্রের জয় দেখছেন, হাইতির জন্য তাঁদের চোখে জল নেই কেন?

এই যাদের রেকর্ড, তারা লিবিয়ায় হানাদারি চালিয়েছে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ দিতে, এ কথা সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তার কোনও মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কি সম্ভব? মিশরে যারা ৩০ বছর ধরে মুবারকের স্বৈরাচারী শাসনকে মদত দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে, সৌদি আরবের মোল্লাতন্ত্রকে সমস্ত রকম ভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে, তারা লিবিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেছে?

লিবিয়া একটি শোষণমূলক পুঁজিবাদী দেশ। জনগণের জন্য প্রভূত তৈলসম্পদে বিত্তশালী লিবিয়া, সে দেশের মানুষের জন্য বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পও একদা চালু করেছিলেন, যার সুফল পেয়েছে জনগণ। যদিও তার দ্বারা ঐ শাসনব্যবস্থার মৌলিক শ্রেণীচরিত্রের বদল কিছু ঘটেনি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর একমেরু বিশ্বে গদ্দাফিও তাঁর দেশে নয়া উদারনীতিবাদী আর্থিক মডেল চালু করেছেন। পরিণামে বেসরকারিকরণ, বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সকল পুঁজিবাদী দেশের জনগণের মতো এখানেও এসব সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনগণের বিক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য তারা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের দেশে ডেকে আনতে চায়, গদ্দাফির হত্যা চায়, ন্যাটো বাহিনীর আগ্রাসন চায় — এই প্রচারের বাস্তব ভিত্তি কী?

সাতের পাতায় দেখুন

দলের প্রতি ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা ও আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে শারদীয় বুকস্টলে

"আপনারা এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন করছেন এবং আপনারাই আমাদের আশা-ভরসা"। কথাটা বর্ধমান জেলার মেমারি নাগপাড়ার যুবক সৌমেন হালদারের। এভাবেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে ঘিরে ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা ব্যক্ত হচ্ছে। সম্প্রতি শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা পর্যন্ত অসংখ্য অস্থায়ী পার্টি বুকস্টল খোলা হয়েছিল। আবার এই বুকস্টলগুলিকে ভিত্তি করে গ্রামে গ্রামে, শহরের পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়েও কর্মীরা বই, পত্র-পত্রিকা তুলে দিয়েছেন মানুষের হাতে। সেখানেও মানুষ নানা ভাষায় দল সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও আশা-ভরসার কথা ব্যক্ত করেছেন।

এবার, বিভিন্ন জেলায় শহরে ও গঞ্জে অস্থায়ী স্টল করার পাশাপাশি ব্লকে ব্লকে সাধারণ ভ্যানরিক্সা ও মোটরভ্যানে ভ্রাম্যমান বুকস্টল করা হয়েছিল, সাথে সাথে কর্মীরাও গ্রুপে ভাগ হয়ে এক এক দিন এক একটি ব্লকের বাজার-গঞ্জ বা ব্যস্ত অঞ্চলে গিয়ে বই বিক্রি করেছেন। তাঁরাও মানুষের কাছ থেকে নানা অভিব্যক্তি পেয়েছেন। কলকাতার বহু স্টলেও এবার জেলার মানুষজন এসে বই নিয়েছেন। যুবকরা, অন্য দলের কর্মীরা, বিশেষত সিপিএমের যেসব কর্মী তাঁদের দলের ভূমিকায় হতাশ হলেও, বামপন্থা ও মার্কসবাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারাননি, তাঁরাও নানা স্থানে স্টলে এসে বাছাই করে বই নিয়েছেন। যেমন পুরুলিয়া শহরে স্টলে এসে এক যুবক নিজেকে সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের একদা নেতৃস্থানীয় কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনাদের বইগুলো দিন তো, এস ইউ সি আই (সি)-কে না জানলে, আপনাদের বই না পড়লে আর চলছে না।'

এবারের স্টলগুলিতে 'কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি ছাড়াও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সর্বশেষ প্রকাশিত বই 'নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি নয়, বিপ্লবী আন্দোলনই মুক্তির পথ' বিশেষভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এমনও ঘটেছে যে, কারও হাতে ঐ বইটি দেখে বা বইটির কথা শুনে অনেকে স্টলে এসে খোঁজ করেছেন। দিল্লির জাকির হুসেন কলেজের এক অধ্যাপক স্টলের যুবকর্মীদের বলেছেন, 'নতুন বই কী কী আছে? শিবদাস ঘোষের বই না পড়ে তো শিক্ষিত হওয়া যাবে না, ফলে তোমাদের বই তো নিতেই হবে'। বীরভূম জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের পূর্বতন সম্পাদক খয়রাশোল নিবাসী সুশীল মণ্ডল বই সংগ্রহ করে বলেছেন, 'শূন্যতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। আপনারা পারবেন'। কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধায় বলেন, 'তিনি মহান মার্কসবাদী চিন্তাবিদ'। সিপিএমের শিক্ষক ফ্রন্টের এক সময়ের নেতা, এস ইউ সি আই (সি) -র ভাষাশিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধতাও করেছিলেন, তিনি এবার রামপুরহাটের স্টলে এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী সংগ্রহ করেছেন, তাঁর পরিচালিত লাইব্রেরিতে তা রাখবেনও।

ঝাড়গ্রাম শহরের স্টলে এসেছিলেন কলকাতা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রবীণ তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিন বই নিয়ে পরের দিন আবার এসে তিনি ছাত্র-যুব কর্মীদের সাথে পরিচয় করেছেন। এই চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতার সময়ে যেভাবে আদর্শের জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করছেন, তার প্রশংসা করে সস্নেহে তিনি বলেন, 'শরীরের যত্ন নিও। আর জ্ঞানের চর্চা কিন্তু করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে'।

কলকাতার বেহালা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি বই দেওয়ার সময়ে কর্মীরা সাক্ষাৎ পেয়েছেন একজন মহিলার। তাঁকে মনীষীদের জীবনের উপর প্রকাশিত কিছু বই দেখানোয় তিনি বলেন, 'অন্য মনীষীদের বই আমার আছে, আমাকে শিবদাস ঘোষের বই দিন। আমি জানতে চাই, শিবদাস ঘোষের বইতে এমন কী শিক্ষা আছে যা পেয়ে, পুজোর সময় অন্যরা যখন আনন্দে ঘুরে বেড়ায়, এ দলের ছেলেমেয়েরা তখন রোদে পুড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে বই বিক্রি করে যায়'।

কলকাতার ধর্মতলার স্টলে এসেছিলেন মালদার এক যুবক, থাকছিলেন এই এলাকার কোনও লজে। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' বইটি নিয়ে রাতেই পড়ে ফেলে পরদিন আবার স্টলে এসে বললেন, 'অসাধারণ একটি বই। কী সুন্দর মূল্যায়ন! অথচ দাম মাত্র ৪ টাকা'। এ ধরনের আর কী বই আছে, সন্ধান করলেন। সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সাহায্য করতে চান বলে জানিয়ে যান তিনি। ধর্মতলার স্টলেই এমন বেশ কয়েকজন যুবক এসেছেন, যাঁরা মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে চেয়ে বলেছেন, 'আমি অন্য দল করি। তবে জানি আপনারাই সাচ্চা দল। তাই আপনাদের বিশ্লেষণ জানতে চাই'।

স্টলে এবার অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' বইটিতে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে বলেছেন, 'এটাই খুঁজছিলাম। আপনাদের অভিমতকে খুব গুরুত্ব দিই আমরা'।

বাঁকুড়ার সোনামুখী শহরে সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলার কয়েকজন সাথী সহ দলের ভ্রাম্যমাণ স্টলের কর্মীদের এসে বলেছেন, 'বই দিন। সিপিএম-কে বিশ্বাস করে আজ আমরা হতাশ, আপনাদের দলকে গভীরভাবে জানতে চাই'।

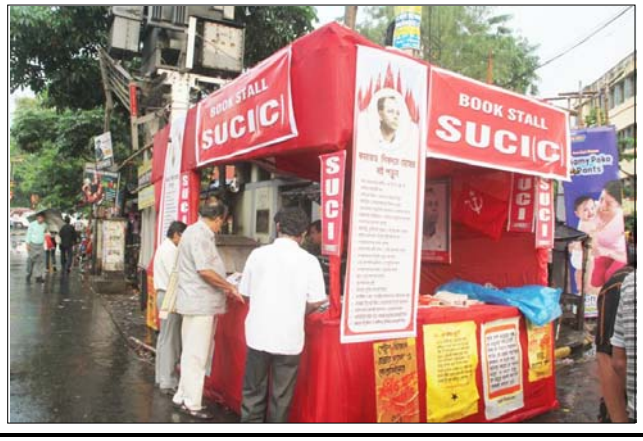

কলকাতার মৌলালি স্টলের সামনে কর্মীদের দেখা হয় মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে। নিজের দল সম্পর্কে গভীর ভালবাসা ব্যক্ত করে বলেন, 'সিপিএম-কে দেখে বামপন্থাকে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু আপনাদের দেখে অন্যরকম মনে হয়, ভরসা জাগে। বই দিন'। টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছেন যোগাযোগের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বাঁকুড়া শহরের স্টলে এসেছিলেন একজন শিক্ষক। বললেন, 'দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকতা করেছি। আমার ছেলেকে আপনাদের শিক্ষা আন্দোলনে, মিটিং-মিছিলে যেতে দিইনি। সে ছেলে বড় হয়ে কলেজ থেকে সিপিএমের পাল্লায় পড়ে, ভোট ভোট করে নিজের সর্বনাশ করেছে, এখন নিজের বৃদ্ধ মা-বাবার কোনও খবরও নেয় না। আর আপনাদের দলের ছেলেমেয়েদের দেখি, কত ভদ্র, সৎ, নির্ভীক। তাই মনস্থ করেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের সমস্ত বই পড়ব। শেষজীবনে যতটুকু পারি, করেও যাব'।

এভাবেই প্রায় সকল জেলাতেই দল সম্পর্কে এই ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা ও আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে গতবারের চেয়েও বেশি বই বিক্রিতে। নিচের পরিসংখ্যান থেকেই যা বোঝা যাবে —

১।	কলকাতা	৩,৩০,০০০.০০
২।	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৯৪,০০০.০০
৩।	উত্তর ২৪ পরগণা	৫৫,০০০.০০
৪।	হাওড়া	৩০,৯৬১.০০
৫।	হুগলি	১৬,০০০.০০
৬।	পূর্ব মেদিনীপুর	১,৪২,০০০.০০
৭।	পশ্চিম মেদিনীপুর	১,২৬,০০০.০০
৮।	বাঁকুড়া	২২,৭৬৯.০০
৯।	পুরুলিয়া	৫১,০০০.০০
১০।	বর্ধমান	২৪,৫৭৪.০০
১১।	বীরভূম	৪৭,০০০.০০
১২।	নদীয়া	৪০,০০০.০০
১৩।	মুর্শিদাবাদ	৮৫,০০০.০০
১৪।	মালদা	১৫,০০০.০০
১৫।	জলপাইগুড়ি	১৫,৯৪৩.০০
১৬।	দার্জিলিং	১৫,০০০.০০
১৭।	কোচবিহার	২৩,৫০০.০০
১৮।	উত্তর দিনাজপুর	৯,০০০.০০
১৯।	দক্ষিণ দিনাজপুর	৯,৩১৬.০০
	মোট	১১,৫২,৫০৩.০০

লিবিয়া

ছয়ের পাতার পর

ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল নামে বিদ্রোহীদের খাড়া করা সংস্থাটির কর্তাব্যক্তিরা কারা? এদের ইতিহাস কী? যেসব সংবাদমাধ্যম লিবিয়ার 'ভেতরকার খবর' বিশ্বে প্রচার করেছে, তারাই বা কারা? এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে লিবিয়ার ঘটনার সত্যাসত্য জানা যাবে না। তবে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, জনগণের ক্ষোভ সঠিক গণআন্দোলনের পথে প্রবাহিত হতে পারেনি বলেই তার সুযোগ নিতে পেরেছে সাম্রাজ্যবাদীরা।

যুগোশ্লাভিয়া যেরকম বহু জাতি-উপজাতির মিলিত ফেডারেশনের মতো ছিল, লিবিয়ার জনগণও সেরকম নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। লিবিয়াতেও বহু ধর্মাবলম্বীর বাস। কিন্তু সেজন্য জাতিগত বা ধর্মীয় দাঙ্গার কোনও ইতিহাস সেখানে পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন ইরাকের ক্ষেত্রেও তেমন ইতিহাস ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয়, এইসব গোষ্ঠীর ছোটবড় নেতাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব বিরোধ নেই, ক্ষমতালিপ্সা নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা এটা খুব ভালো করে জানে বলেই যে দেশকে তারা পদানত বা দখল করতে চায়, সে দেশে 'আভ্যন্তরীণ গণবিক্ষোভ' দেখাতে এই ধরনের উপজাতিগত, জাতিগত দ্বন্দ্ব-ঈর্ষাকে উসকিয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত করে দেয়। সে জন্য অর্থ ও অস্ত্র জোগায়। লিবিয়াতেও ঠিক এই কাণ্ডটিই তারা করেছে।

গদ্দাফিকে হত্যা করে লিবিয়া দখলের পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদীরা বহু আগেই সেরে ফেলে। মনে হতে পারে যে, লিবিয়ার তৈলসম্পদ দখল করাই বোধহয় এই হানাদারির পিছনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তব তা নয়। মূল উদ্দেশ্য হল, লিবিয়াকে টুকরো টুকরো করে গোটা আফ্রিকা দখলের পথকে বাধামুক্ত করা। একসময় লিবিয়া বিভক্ত ছিল ত্রিপোলিটানিয়া, সাইরেনাইকা এবং ফেজান —এই তিনটি ভাগে। গত মার্চ মাসে আমেরিকার ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স জেমস ক্ল্যাপার মার্কিন সিনেটে বলেন, লিবিয়ায় এই সংঘর্ষের পরিণতিতে একসময় রাজতন্ত্রের অধীনে লিবিয়া যেমন তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, আবার তাকে সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। একদা এই অঞ্চলগুলো ফরাসি, ব্রিটিশ ও ইটালি সাম্রাজ্যবাদের অধীনে যেভাবে উপনিবেশ হিসাবে ছিল, আজ আমেরিকা সহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর লক্ষ্য, কার্যত সেই ঔপনিবেশিক দখলই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

লিবিয়াকে আফ্রিকার গেটওয়ে বলা হয়। সেই লিবিয়ায় গদ্দাফির মতো স্বাধীনচেতা, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শাসক ক্ষমতায় থাকলে স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদীদের আফ্রিকায় আধিপত্য স্থাপনের পরিকল্পনা বাধা পেতে বাধ্য। যে লিবিয়াকে ধ্বংস করা হল, সেই লিবিয়াকে গড়ে তুলেছিলেন গদ্দাফি। নানা উপজাতিতে বিভক্ত, হানাহানিতে জর্জরিত লিবিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে ঔপনিবেশিক পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আধুনিক জাতীয় পুঁজি সমৃদ্ধ লিবিয়া গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এটা করতে গিয়ে তিনি কট্টর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয়ে ওঠেন। আফ্রিকাতে তিনিই ছিলেন একদা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখ, অধুনা সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কিছুটা আলগা হলেও, সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত সেবক তিনি হতে পারেননি। ফলে গদ্দাফি হঠাও অভিযান।

শুধু লিবিয়া নয়, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ আজ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের পাখির চোখ। পেন্টাগন ২০০২ সালে প্রথম আফ্রিকাকে সামরিক দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা শুরু করে প্যান-সাহেল প্রজেক্টের আড়ালে। আসলে ২০০১ সালের ৯/১১-র পর পরই প্যান-সাহেল-এর পরিকল্পনা করে পেন্টাগন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন সামরিক বাহিনী মালি, চাদ, মরিশানিয়া এবং নিগার-এর বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার চুক্তি করে মার্কিন প্রশাসন। লিবিয়া, সোমালিয়া এবং সুদানে সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা তখনই ছকে ফেলে পেন্টাগন এবং হোয়াইট হাউস। ২০০১ থেকে শুরু করে ২০০৮ পর্যন্ত নানা সামরিক পরিকল্পনায় পেন্টাগন সামরিক ট্রেনিং, সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা ইত্যাদির নামে চাদ, মরিশানিয়া, মরক্কো, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, তিউনিশিয়া, আলজিরিয়াতে সামরিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এর জন্য শেষপর্যন্ত ২০০৮ সালের ১ অক্টোবর আফ্রিকম গড়ে তোলে পেন্টাগন। তাদের এই চক্রান্তে ইজরায়েল সার্বিক ভাবে যুক্ত থাকে। ন্যাটোর মত একটি সামরিক জোট হল আফ্রিকম। আফ্রিকার অভ্যন্তরে এটি কাজ করবে ন্যাটোর মতোই মার্কিন ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে। এদের প্রথম লক্ষ্য ছিল লিবিয়া। গদ্দাফি শাসিত লিবিয়াকে ধ্বংস করার জন্য বহু আগে থেকেই চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালেই বর্তমান ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের কর্মকর্তারা তাদের এক বিশেষ সম্মেলনের বিষয় করেছিল 'গদ্দাফি পরবর্তী লিবিয়া ঃ ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা'। ২০০৫ সালেও লন্ডনে এদের উদ্যোগেই আবার লিবিয়ার শাসন পরিবর্তন নিয়ে সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে কীভাবে ন্যাটোকে দিয়ে হস্তক্ষেপ করানো যায়, তা নিয়েও সবিস্তার পরিকল্পনা রচিত হয়।

তাই গদ্দাফি হত্যার বিবরণ যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার, গদ্দাফির কনভয়ে ন্যাটোই বিমান থেকে বোমা মেরেছিল। ফলে, গদ্দাফিকে হত্যার ক্ষেত্রে লিবিয়ার তথাকথিত বিদ্রোহীরা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে মাত্র। আসল খুনি মার্কিন-ব্রিটিশ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ। কেন এদের বিচার হবে না?

কিন্তু আজকের দুনিয়ায় কে এদের বিচার করবে? এই খুনিরাই তো আজ বিশ্ব আদালতের শীর্ষে বসে। এদের বিচার করে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে একমাত্র যথার্থ জনআন্দোলন। আমেরিকার মানুষ আজ কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে, ফ্রান্সে গণবিক্ষোভ ছড়াচ্ছে, ব্রিটেনের শাসকরাও বিক্ষোভ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যেও দেশে দেশে চাকরির দাবিতে, খাদ্যের দাবিতে, ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন বিক্ষোভের ঢেউ। এ সমস্ত গণআন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আঘাত হানতে পারলেই একমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, আক্রমণ ও দখলদারি রুখে দেওয়া যেতে পারে। তাই, এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্বের সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আন্তরিক আবেদন জানিয়েছে।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

আসামের কাছাড় জেলার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ধোয়ারবন্দ লোকাল কমিটির সদস্য ও দলের একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড মন্টু রায় ৩ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামদেও কুর্মী। কমরেড মন্টু রায় ১৯৮২ সালে দলের সাথে যুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। দলের সাংগঠনিক বিস্তারে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও কর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি দলের সকল স্তরের কর্মীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দলের সমস্ত কর্মসূচিতেই তিনি অতি উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমরেড মন্টু রায় লাল সেলাম

ওড়িশা রাজ্য সেভ এডুকেশন কনভেনশন

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্য অযোগ্য সকলকেই ঢালাও পাশ করিয়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। সেই নীতিই চালু করতে যাচ্ছে ওড়িশার বিজেডি সরকারও। এদিকে হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য। সেখানে নিয়োগের কার্যকর উদ্যোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে পাশফেল প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল ওড়িশা রাজ্য সেভ এডুকেশন কনভেনশন।

রামমনোহর লোহিয়া হলে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার নায়ক। সম্পাদক ডঃ রমেশ নায়কের পেশ করা মূল প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন বিদ্বজ্জন আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক জি দাস দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারকদের 'শিক্ষাঘাতক' রূপে অভিহিত করেন। অধ্যাপক এল পি সিংহ বলেন, উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার স্বার্থেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাঁচানো দরকার। প্রধান বক্তা অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত দেশে সেভ এডুকেশন আন্দোলন গড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আন্দোলন ছাড়া শিক্ষা বাঁচানোর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার স্বার্থেই সরকারি শিক্ষার সমাধি রচনা করছে সরকার। সমস্ত বক্তাই শিক্ষক সমাজের মধ্যে ব্লকগ্রান্ট টিচার, কনট্রাকচুয়াল টিচার, শিক্ষা সহায়ক, প্যারা টিচার, শিক্ষাকর্মী ইত্যাদি নানা বিভাজন সৃষ্টির বিরোধিতা করেন। এই কনভেনশন থেকে ওড়িশা রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মেদিনীপুরে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এম এস এস

মেদিনীপুর শহরের বটতলাচক কালী মন্দিরের কাছে ১৫ অক্টোবর রাত্রি ৮টায় রুকমি বেহারা নামে এক পরিচারিকার উপর বর্বরোচিত অত্যাচার হয়। কাজ করে তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন দুষ্কৃতীরা তাঁকে মারধর ও বিবস্ত্র করে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে। তাঁর মাথার চুল কেটে নেওয়া হয় এবং গাছের সাথে বেঁধে রেখে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ করে ১৭ অক্টোবর এম এস এস-এর পক্ষ থেকে ডি এম কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে এম এস এস-এর পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়।

শ্যামপুরে এ আই এম এস এস-এর আঞ্চলিক সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাওড়া জেলার শ্যামপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ৩ অক্টোবর তৃতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড মাধবী প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হাওড়া জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড মিনতি সরকার। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমিটির সম্পাদিকা জ্যোতির্ময়ী মণ্ডল। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই বক্তব্য রাখেন। 'আমি সেই মেয়ে' কবিতাটি পাঠ করে শোনান অর্চনা বেরা। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা পুতুল চৌধুরী। অর্চনা বেরাকে সভাপতি, জ্যোতির্ময়ী মণ্ডলকে সম্পাদিকা, রমা খাটুয়াকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ঝাড়খণ্ডে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

জনসাধারণের নানা সমস্যা নিয়ে ঝাড়খণ্ডে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এস ইউ সি আই (সি)। ১২ সেপ্টেম্বর পূর্ব সিংভূম জেলার জামশেদপুরে মূল্যবৃদ্ধি, জলসংকট, উন্নয়নের নামে গরিব মানুষের উচ্ছেদ, শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের দাবিতে ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেডস বিমল দাস, সীতারাম টুডু, সুমিত রায়, ধীরেন ভগত, সনকা মাহাতো, সরলা মাহাতো, রুদ্র দাস, সুনীল মাহাতো প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায় কর্নেল গদ্দাফির নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা করল আই এ পি এস সি সি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদতে তথাকথিত বিদ্রোহীদের দ্বারা কর্নেল মুয়াম্মার গদ্দাফির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কোঅর্ডিনেটিং কমিটি (আই এ পি এস সি সি) ২১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গণতন্ত্র ও নাগরিকদের রক্ষার নামে মার্কিন-ন্যাটো বাহিনী লিবিয়ার সার্বভৌমত্বের উপরে বর্বর আক্রমণ হেনেছে। এ ঘটনা দেশে দেশে শাসক পরিবর্তনের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই আরও একটি উদাহরণ। ঠিক এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম হিংস্রতার সঙ্গে শাসক বদল ঘটিয়েছে ইরাক ও আফগানিস্তানে।

লিবিয়া কিংবা অন্য যেকোনও দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অথবা সে দেশের মানুষের উপর কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই সাম্রাজ্যবাদীদের। একটি দেশের নাগরিকদেরই একমাত্র অধিকার আছে তাদের নিজস্ব শাসক ও শাসনব্যবস্থা নির্বাচন করার। আসলে, লিবিয়ায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পুতুল সরকার বসিয়ে সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করাই হল সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা।

লিবিয়ার পর সিরিয়া, ইয়েমেন, বাহারিন প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির উপর এ ভাবেই আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদীদের রয়েছে বলে আই এ পি এস সি সি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে প্রতিবাদে এগিয়ে এসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী হীন মতলবের বিরুদ্ধে দেশে দেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়ে কমিটি বলেছে, আমরা লক্ষ করছি, পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত মানুষ খাদ্য, আশ্রয় ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যে উৎপীড়ক শাসকদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। কিন্তু এই আন্দোলনগুলির মধ্য থেকে যদি যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব উঠে না দাঁড়ায়, তাহলে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না এবং সাম্রাজ্যবাদীরা বার বার এই আন্দোলনগুলির অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাবে, এগুলিকে ব্যবহার করবে নিজেদের হীন স্বার্থ সাধনে এবং সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট কার্যকলাপগুলিকে 'গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন' বলে ছাপ দেবে। ফলে, বর্তমানে প্রয়োজন হল, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে সংগঠিত ও সংযোজিত করা।

লোডশেডিং ও মাশুল বৃদ্ধি বন্ধ করে জনমুখী বিদ্যুৎ নীতি ঘোষণার দাবিতে অ্যাবেকার ডাকে ৯ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গণডেপুটেশন

জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১টা

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সমস্ত ছাত্রদের বসতে দিতে হবে

প্রাথমিক স্তরে বৃত্তি পরীক্ষা চালুর দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে। এই দাবির পক্ষে প্রবল জনসমর্থন থাকলেও পূর্বের সিপিএম সরকার এই দাবির প্রতি কোনও মান্যতা দেয়নি। সম্প্রতি রাজ্যের নতুন সরকার প্রাথমিক স্তরে বৃত্তি পরীক্ষা ফিরিয়ে আনা হবে বলে ঘোষণা করেছে।

বহু বছর ধরে এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় এই বৃত্তি পরীক্ষা চলে আসছিল। অতীতে চতুর্থ শ্রেণীর শেষে এটাই ছিল প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনোর পরীক্ষা। ছোট ছোট শিশুরা যারা প্রথম শ্রেণীতে এসে ভর্তি হত — চার বছর লেখাপড়ার পরে তাদের মানসিক ভিতটা শক্ত হত। অন্য স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে সাহসের সঙ্গে পরীক্ষায় বসত। তখন শিক্ষাবর্ষ শুরু হত জানুয়ারি থেকে। ডিসেম্বরে শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার আগে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হত। ডিসেম্বরের শেষভাগে ফল বেরুত। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা রেজাল্ট শিট সংগ্রহ করতেন। স্কুলগুলির মধ্যে একটা আলোচনা প্রায়শই শোনা যেত — কোন স্কুলের ক'টি ছেলেমেয়ে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, কতজন পাশ করল, কতজন পাশ করতে পারল না। ভালো ফল করলে — তাঁরা যেমন আনন্দিত হতেন, আবার যাঁদের ফল ভালো হত না — তারাও মনে মনে শপথ নিতেন — পরের বছর ভালো ফল করার জন্য। এই নীরব প্রতিযোগিতা স্কুলগুলিতে শিক্ষার মানকে যে অনেকটা উন্নত করেছিল — এতে কোনও সন্দেহ নেই। লক্ষণীয় বিষয় ছিল — যেহেতু পূজার ছুটির পর এই পরীক্ষা নেওয়া হত, ফলে প্রায় সমস্ত স্কুলেই পূজার ক'টা দিন বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলিতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্পেশাল কোচিং ক্লাস (বিনামূল্যে) করা হত। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে আসতেন, কোচিং-এ আসার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তাদের ভালোভাবে তৈরি করে দেওয়ার একটা প্রবণতা কাজ করত। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই আনন্দের সঙ্গে পঠন-পাঠনের কাজটা সমাধা করতেন। ভালো ফল করতে হবে — এই প্রতিযোগিতার মনোভাব সকলের মধ্যেই প্রতিফলিত হত, শিক্ষা প্রাণ পেত।

কিন্তু হঠাৎই দেখা গেল, ১৯৭৭ সালে সিপিএম সরকার এসে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের কথা বলে ঘা দিলেন প্রাথমিক স্তরে। প্রাথমিকে ইংরেজি, পাশ-ফেল প্রথা বিসর্জনের পাশাপাশি বৃত্তি পরীক্ষাও তুলে দেওয়া হল। সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য আবশ্যিক এই পরীক্ষাটি '৭৭ সালে তৎকালীন সরকার বন্ধ করে দিল। কিন্তু জনমতের চাপে কয়েক বছর স্কুল পিছু অনধিক ৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে 'বৃত্তি পরীক্ষা' চালাল। কিন্তু এর কোনও ফল প্রকাশ বা পাশ-ফেল প্রথা ইত্যাদি কিছুই না থাকায় পরীক্ষাটির কোনও তাৎপর্য ছিল না। ফলে পরীক্ষাটা হয়ে দাঁড়াল প্রহসন। সরকারও বোধহয় এটাই চাইছিল। '৮৪ সালে এই পরীক্ষাটিও তারা বন্ধ করে দেয়। ফলে, শিক্ষায় নেমে আসে অন্ধকার। ইংরেজি নেই, পাশ-ফেল বলে কিছু নেই। বৃত্তি পরীক্ষা নেই। পড়লেও পাশ, না পড়লেও পাশ। স্কুলে এলেও পাশ, না এলেও পাশ। এমনকী চার বছর ধরে নিজের নামটুকু লিখতে না পারলেও তরতরিয়ে চতুর্থ শ্রেণী পাশ হতে কোনও বাধা নেই। এর ফলে জনমানসে দানা বাঁধতে শুরু করল তীব্র অসন্তোষ। তাকে চাপা দিতে কায়দা করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি পরীক্ষা শুরু করা হল ১৯৯৯ সালে। নাম দেওয়া হল বহির্মূল্যায়ন। কিন্তু এই পরীক্ষাও শুরু থেকেই ধিক্কৃত হল। কারণ, এটা ছিল উত্তর বলে দেওয়ার পরীক্ষা। শুধু বলা নয়, পরীক্ষার সময় বোর্ডে লিখে দেওয়া, না পারলে হাত ধরে লিখিয়ে দেওয়া, তাও না হলে পেনসিলে লেখা মুছে নম্বর বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবই করা। ফলে জনমনে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ২০০৪-০৫-এ এসে সরকার শুরু করল চতুর্থ শ্রেণীতে একটি পরীক্ষা। নাম দেওয়া হল 'ডি এ টি' (বাংলায় এর অর্থ 'সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা')। যদিও এটির উদ্দেশ্য ছিল অন্য। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে ঐতিহাসিক আন্দোলনের চাপে তৎকালীন সরকার ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ' বেসরকারিভাবে চতুর্থ শ্রেণীতে যে বৃত্তি পরীক্ষা চালু করেছিল ১৯৯২ সাল থেকে, 'ডি এ টি' ছিল তাকে হেয় করার অপচেষ্টা। কিন্তু দু'বছর ঐ পরীক্ষা চালানোর পর তারা হটে গিয়ে শুরু করলেন তৃতীয় শ্রেণীতে ঐ একই নামে একটি পরীক্ষা। কিন্তু দ্বিতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মতো এরও হাল দাঁড়াল একই।

অথচ পাশাপাশি বহু প্রতিকূলতার মধ্যে এমনকী সরকারি বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও আন্দোলনের অংশ হিসাবে পরিচালিত এই বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষার প্রতি মানুষের কি প্রবল আগ্রহ। ১৯৯২ সালে ২০ হাজার পরীক্ষার্থী দিয়ে যে পরীক্ষা শুরু হয় — তা ক্রমাগত জনপ্রিয় হতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। বর্তমানে প্রায় পৌনে চার লক্ষ পরীক্ষার্থী বসছে এই পরীক্ষায়। ২১ বছর ধরে চলছে এই পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ-ফেল আছে, উত্তীর্ণদের জন্য আছে শংসাপত্র। বিশেষ কৃতীদের জন্য আছে বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা। প্রতি বছর লক্ষ টাকার বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এই বৃত্তির টাকা যোগাচ্ছেন শিক্ষাপ্রেমী সাধারণ মানুষেরাই। তাঁরা যেমন ধিক্কার জানিয়েছেন সরকারি প্রহসনমূলক পরীক্ষার প্রতি, তেমনি দু'হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছেন এই বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষাকে। এতেই প্রমাণ হয় মানুষ কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চান।

লালগড়ে নেতাইয়ের একটি পরীক্ষা কেন্দ্র

অথচ বিগত সরকারের ৩৪ বছরের শাসন বৃত্তিপরীক্ষা চালু করার এই ন্যায়সঙ্গত দাবিটিকে কোনও মর্যাদা দেয়নি। বহুবার বহুভাবে শিক্ষক-অভিভাবকরা এবং ছাত্রসমাজ দাবিটি তুলে ধরেছেন, কিন্তু বারবার তা উপেক্ষিত হয়েছে।

সম্প্রতি নতুন রাজ্য সরকার রাজ্যের জনমানসিকতা লক্ষ করে এই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে মর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করেছেন — চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই স্বীকৃতি দীর্ঘ ৩৪ বছরের ন্যায়সঙ্গত দাবিকেই মর্যাদা দেওয়া। রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা, শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কথা বলাই নয়, চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে, শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে পাশ-ফেল প্রথার প্রচলন সহ নম্বর উল্লেখ করে মার্কশিট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র দেওয়ার এবং কৃতী মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এর ফলে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে, লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি হবে, শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে, স্কুলছুটের হার কমবে, শিক্ষা আবার প্রাণ ফিরে পাবে। তবেই সার্থক হবে বৃত্তি পরীক্ষার সরকারি ঘোষণা।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বালুরঘাটে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

বৃত্তি পরীক্ষা ঃ সরকারি ঘোষণায় আন্দোলনের প্রতি স্বীকৃতি

প্রাথমিক স্তরে চতুর্থ শ্রেণীর শেষে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীর জন্য বৃত্তি পরীক্ষা চালু করার রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ অক্টোবর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পঃ বঃ-এর সম্পাদক রতন লস্কর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

বিগত সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে এ রাজ্যের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন এবং তার ধারাপথে প্রয়াত ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার চাপে ইংরেজি প্রাথমিক স্তরে চালু হয়েছে। কিন্তু আজও চালু হয়নি পাশ-ফেল প্রথা।

বর্তমান রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাথমিক স্তরে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের প্রতি স্বীকৃতি দান। কিন্তু শুধু কতিপয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বৃত্তি পরীক্ষা নয়, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চাই পাশ-ফেল প্রথানির্ভর সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত, কেবলমাত্র এর দ্বারাই আগামীদিনে শিক্ষার যথার্থ মানোন্নয়ন সম্ভব। আশা করি, অবিলম্বে রাজ্য সরকার এই পথে অগ্রসর হবে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।